কথা ও কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথা ও কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

কথা : ১৩০৬

কাহিনী, কথা : মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত : ১৩১০

কথা ও কাহিনী : স্বতন্ত্র সংস্করণ ইন্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস : ১৯০৮

কথা ও কাহিনী : বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ : ১৩৩২, ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৩৮
১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪৩, ১৩৪৪, ১৩৪৫, ১৩৪৭, ১৩৪৮, ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫০
১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ১৩৫৪, ১৩৫৫, ১৩৫৮, ১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৩
১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ১৩৭১, ১৩৭৩, ১৩৭৫
১৩৭৮, ১৩৮০, ১৩৮০, ১৩৮১, ১৩৮২, ১৩৮৩, ১৩৮৪
১৩৮৬, ১৩৮৬, ১৩৮৮, ১৩৯১, ১৩৯২, ১৩৯৩
১৩৯৪, ১৩৯৪, ১৩৯৬, ১৩৯৭

ভাদ্র ১৩৯৮

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীচঞ্চল ঘোষ
বর্ণাক্ষর। ৩০/১এ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

কথা

কাহিনী

উৎসর্গ

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য

করকমলেষু

সত্যরত্ন তুমি দিলে— পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত-কাহিনাগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ-বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে— আশা করি, সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-বিধান-মতে দণ্ডণীয় গণ্য হইব না।

[১৩০৬] গ্রন্থকার

কথা

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকলভাষ নীরব তাহার—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন,
তুমি তারে কোথা লও।
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে,
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও—
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

অবদানশতক

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন

"প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি"—
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।
সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগনলগন
প্রাসাদে।

বৈতালিক-দল সুপ্তিতে শয়ান
এখনো ধরে নি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।
ভিক্ষু কহে ডাকি, "হে নিদ্রিত পুর,
দেহো ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর।"
সুপ্ত পৌরজন শুনি সেই সুর
শিহরে।

সাধু কহে, "শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার ;
সব ধর্ম-মাঝে ত্যাগ ধর্ম সার
ভুবনে।"
কৈলাসশিখর হতে দূরাগত
ভৈরবের মহাসংগীতের মতো
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে।

রাজা জাগি ভাবে— বৃথা রাজ্য ধন ;
গৃহী ভাবে— মিছা তুচ্ছ আয়োজন ;
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।
যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর,
মনে হল, তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা।

বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুম-ভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে
অন্ধকার পথ কৌতূহল-ভরে
নেহারি।

"জাগো, ভিক্ষা দাও" সবে ডাকি ডাকি
সুপ্ত সৌধে তুলি নিদ্রাহীন আঁখি
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারি।

ফেলি দিল পথে বণিকধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতনকণিকা—
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে পূরে—
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে।
ভিক্ষু কহে, "ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহো গো।"

বসনে ভূষণে ঢাকি গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলি—
সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে—
"ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান্।
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।"

ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট—
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।
রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ ;
মহানগরীর পথ হল শেষ—
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।

দীননারী এক ভূতলশয়ন,
না ছিল তাহার অশন ভূষণ—
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।
অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ—
কহে, "ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।"

চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর-
আলোকে।

৫ কার্তিক ১৩০৪

প্রতিনিধি

অ্যাকওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরাজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভগোয়া ঝেণ্ডা' নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা এক দিন—
রামদাস, গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড—
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ!
সব যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরও নাই বাসনার শেষ!
এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।
কহিলা, দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে।
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে—
"গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গপাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।"

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ কত অশ্বরথ—
"হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি, হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।"

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ;
কহিলেন, "পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন্ গুণ আছে তব গুণী।"

"তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান"
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, "এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরোথরে ;
ভাবে, ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম-কাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি—
"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি।"

অবশেষে দিবসান্তে নগরের একপ্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি—
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, "নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস— আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।"

গুরু কহে, "তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।
বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ-সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।"
কহিলেন গুরু রামদাস।

নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিল রামদাস—
"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস।
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।"

৬ কার্তিক ১৩০৪

ব্রাহ্মণ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি, কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ-কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে ; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, "বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।"

হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি', পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি' ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে,
"ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষা-তরে কুশক্ষেত্রবাসী,
সত্যকাম নাম মোর।"

শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
"কুশল হউক সৌম্য। গোত্র কী তোমার
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।"

বালক কহিলা ধীরে,
"ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কলা, করো অনুমতি।"

এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেল চলি সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার

বনবীথি দিয়া পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী— বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটিরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি ; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
"কহো গো, জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষা-তরে
গৌতমের কাছে ; গুরু কহিলেন মোরে,
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার।"

শুনি কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, "যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি তাত।"

পরদিন
তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত; যত তাপসবালক
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলিগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণকণ্ঠে সম্মিলিত সুর—
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস্ করি শুধাইলা তবে,
"কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন।"

তুলি শির কহিলা বালক, "ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম

জননীরে ; কহিলেন তিনি, সত্যকাম,
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।”

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো— সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন ;
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, “অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত.
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।”

৭ ফাল্গুন ১৩০১

মস্তকবিক্রয়

মহাবস্তুবদান

কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা।
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।

সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে!
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশি!
ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি।"
কহিলা, "সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
সৈন্য করো সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!"
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে

রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধলাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।
কাশীর রাজা হাসি কহে তখন
আপন সভাসদ-মাঝে,
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।"

সকলে কাঁদি বলে, "দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহে না ধর্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"
কাঁদিয়া কহে দশ দিক—
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্।"
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি—
"নগরে কেন এত শোক!
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক!
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!

অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু,
শাস্ত্রে এই মতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগর-মাঝে,
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনকশত দিব তারে।”
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিন রাত—
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে—
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে—
“কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ—
কোশলে যাব কোন্ মুখে।”
শুনিয়া রাজা কহে, “অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে।”
পথিক কহে, “আমি বণিক্‌জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।

এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি !
করুণাপারাবার কোশলপতি,
শুনেছি নাম চারি ধারে—
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।”
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি—
“পান্থ, যেথা তব বাসনা পুরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।”

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে ;
দাঁড়ালো জটাধারী এসে।
“হেথায় আগমন কিসের কাজে”
নৃপতি শুধাইল হেসে।
“কোশলরাজ আমি, বনভবন”
কহিলা বনবাসী ধীরে—

"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে।"
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল—
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল্‌।
মৌন রহি রাজা ক্ষণেক-তরে
হাসিয়া কহে, "ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি!
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"

জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
বসালো নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
'ধন্য' কহে পুরজনে।

২১ কার্তিক ১৩০৪

পূজারিনী

অবদানশতক

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ,
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,

সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।"

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা,
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে।"

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, "অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদপাত।"

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী;
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে!"

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি।
"হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি কয়—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।"
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

...

দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হল সমাধান"
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কাননমাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো!

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"
মধুর কণ্ঠে শুনিল, "শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সে দিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

১৮ আশ্বিন ১৩০৬

অভিসার

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।

অঙ্গে আঁচল সুনীলবরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
"ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর—
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর—
এ নহে তোমার শয্যা।"

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
"অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,

এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।”

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

...

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির মন্দ্র।

জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বার বার—
এত দিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসাররাত্রি।

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির-প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে—
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে
তাঁহার চরণোপান্তে।

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ।

রোগমসী-ঢালা কালি তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীতচন্দনপঙ্কে।

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী। সন্ন্যাসী কয়,
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।"

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ

মহাবস্তুবদান

“রাজকোষ হতে চুরি ! ধরে আন্ চোর,
নহিলে, নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুণ্ড রহিবে না দেহে !” রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী বণিক পান্থ, তক্ষশীলাবাসী ;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোওয়াইয়া নিঃস্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি।
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

সেই ক্ষণে
সুন্দরীপ্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি— নয়নসম্মুখে

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, "আহা মরি, মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে! শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি—
শ্যামা ডাকিতেছে তারে; বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি।" শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত; সত্বর পশিল গৃহ-মাঝে,
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
"অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ। চলেছি সম্প্রতি
রাজকার্যে— সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।"
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা,
"একি লীলা হে সুন্দরী, একি তব লীলা!
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অবমান!" শুনি শ্যামা কহে,
"হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।

আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।"
এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে,
"আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।" কহিল প্রহরী,
"তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না!" ধরি প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, "শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো, এ মিনতি করি।"
"রাখিব তোমার কথা" কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ ইঙ্গিতে

রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদস্বরে,
"বিকারের বিভীষিকা-রজনীর পরে
করধৃত-শুকতারা শুভ্র-উষা-সম
কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম—
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুরনগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী?"
"আমি দয়াময়ী!"— রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা,
"এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।"
এত বলি দৃঢ়বলে ধরি হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে
পূর্ববনান্তরে; ঘাটে বাঁধা আছে তরী।

"হে বিদেশী, এসো এসো" কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে, "হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবনমরণপ্রভু!" নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ-উৎসবগান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক
বজ্রসেন শুধাইল, "কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী,
এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।" আলিঙ্গন ঘনতর করি
"সে কথা এখন নহে" কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
তূর্ণ স্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট; কোলাহল

থেমে গেছে দুই তীরে, জনপদ-বাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষীনীড় গীতশব্দহীন;
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন;
পক্বশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়,
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
"ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
মোর লাগি কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে,
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।" বস্ত্র টানি মুখোপরি
"সে কথা এখনো নহে" কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে

অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।

শুক্লচতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়—
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো ; ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা ; পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা, "প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব ;
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো— বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে

তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।"

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহামাঝে; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি— মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা। মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্ত নারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, "ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।"
চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে, "আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী!
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে!"

এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেলা তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতি ক্ষণে। ঘন গুল্মগন্ধ পুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে; তরুকাণ্ডগুলি
চারি দিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হল চারি ধার;
নিস্তব্ধনিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্ত কলেবর
পথিক বসিল ভূমে।

কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম। সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ ক'রে
গর্জিল পথিক, "তবু ছাড়িবি না মোরে?"
রমণী বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গ-সম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্তবেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘননিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার; আর্দ্রগদ্‌গদবচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায় "ছাড়িব না— ছাড়িব না"
কহে বারম্বার, "তোমা লাগি পাপ, নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত—
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।"
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতিস্বর; তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন,
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ-বরন
মন্দিরত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদীধারে-ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।
ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে, "কে গো গৃহছাড়া,
এসো আমাদের ঘরে।" দিল না সে সাড়া।
তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি; শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি, ঝংকার তাহার
শতমুখ শর-সম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি; রাশীকৃত করি
তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি—

সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।

শুক্লপঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণতরুশিরে পড়িয়াছে নামি
শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন "এসো এসো প্রিয়া"
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম!
"এসো এসো প্রিয়া!" "আসিয়াছি প্রিয়তম"—
চরণে পড়িল শ্যামা, "ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে।" শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ-'পরে;
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বাহু মেলি
চমকি উঠিল, তারে দূরে দিল ঠেলি,
গরজিল, "কেন এলি, কেন ফিরে এলি।"
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি,
জ্বলন্ত অঙ্গার-সম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি।
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি

লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, "যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও!"

নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে; পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল; তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমিরমাঝে মিলায় যেমন।

২৩ আশ্বিন ১৩০৬

সামান্য ক্ষতি

দিব্যাবদানমালা

বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শত সখী-সনে
কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজশাসনে।
নিকটে যে-ক'টি আছিল কুটির
ছেড়ে গেছে লোক ; তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখির
কূজন উঠিছে কাননে।

আজি উতরোল উত্তর-বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।

সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলোছলে,
লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।
মৃণালভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে
মহিষী কহিলা, "উহু, শীতে মরি
সকল শরীর উঠিছে শিহরি ;
জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।"

সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।

কৌতুকরসে পাগলপরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য-আননে—

"ওলো, তোরা আয়, ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে।
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল।"
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

কহিল মালতী সকরুণ অতি,
"একি পরিহাস রানীমা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি—
এ কুটির কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা!"

রানী কহে রোষে, "দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে!"

অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।

ঘনঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হু হু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী,
ফণা নাচাইয়া অম্বর-পানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে—
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপকরাগিণী।

প্রভাত-পাখির আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল—

দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তরবায়ু হইল প্রবল,
কুটির হইতে কুটিরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী-সাথে
ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে,
দীপ্ত-অরুণ-বসনা।

...

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়া ছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদ্গদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা,
রক্তিম মুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার—
কহিলা, "মহিষী, একি ব্যবহার!
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন্ রাজধরমে!"

রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,
"গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর!
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।"

কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে,
"যত দিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।"

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া ;
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল রানীদেহে তুলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-ক'টি কুটির হল ছারখার
যতদিনে পারো সে-ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

"বৎসরকাল দিলেম সময় ;
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।"

২৫ আশ্বিন ১৩০৬

মূল্যপ্রাপ্তি

অবদানশতক

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া ;
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন—
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন,
"অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার।
বুদ্ধ ভগবান আজ এসেছেন পুরমাঝ,
তাঁর পায়ে দিব উপহার।"
মালী কহে, "এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।"
পথিক চাহিল তাহা দিতে—
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অর্ঘ্য ব'হে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।

রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধ-দরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, "কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।"
মালী কহে, "হে রাজন্, স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয় !"
"দশ মাষা দিব আমি" কহিলা ধরণীস্বামী,
"বিশ মাষা দিব" পান্থ কয়।
দোঁহে কহে "দেহো দেহো", হার নাহি মানে কেহ ;
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে, যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত।
কহিল সে করজোড়ে, "দয়া ক'রে ক্ষমো মোরে,
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।"
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন-প্রশান্ত-মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

সুদাস রহিল চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি
মুখে তার বাক্য নাহি সরে—
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
"কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।"
ব্যাকুল সুদাস কহে, "প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।"

২৬ আশ্বিন ১৩০৬

নগরলক্ষ্মী

কল্পদ্রুমাবদান

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা।"

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি, "ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি—
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।"

কহিল সামন্ত জয়সেন,
"যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ।"

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
"কী কব, এমন দগ্ধ ভাল—
আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত
রাজকর জোগানো কঠিন।
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।"

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
"ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ-হেন কঠিন গুরু কাজ।
কী আছে তোমার কহো আজ।"

কহিল সে নমি সবা-কাছে,
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

"আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

২৭ আশ্বিন ১৩০৬

অপমানবর

ভক্তমাল

ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে, "মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো।"
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে, "তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে।"
কেহ কয়, "ভবে আছেন বিধাতা, বুঝাও প্রমাণ ক'রে।"

কাঁদিয়া ঠাকুরে কাতর কবীর কহে দুই জোড় করে,
"দয়া ক'রে, হরি, জন্ম দিয়েছ নীচ যবনের ঘরে—
ভেবেছিনু কেহ আসিবে না কাছে অপার কৃপায় তব,
সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় রব।
এ কী কৌশল খেলেছ মায়াবী, বুঝি দিলে মোরে ফাঁকি।
বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি।"

ব্রাহ্মণ যত নগরে আছিল উঠিল বিষম রাগি—
লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণধুলার লাগি!
চারি-পোওয়া কলি পুরিয়া আসিল পাপের বোঝায় ভরা,
এর প্রতিকার না করিলে আর রক্ষা না পায় ধরা।

ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে ;
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, কাঞ্চন দিল হাতে।

বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে,
সহসা কামিনী সবার সামনে কাঁদিয়া ধরিল তারে।
কহিল, "রে শঠ, নিঠুর কপট, কহি নে কাহারো কাছে—
এমনি ক'রে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে!
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্নবসন বিহনে আমার বরন হয়েছে কালো।"

কাছে ছিল যত ব্রাহ্মণদল করিল কপট কোপ,
"ভণ্ড তাপস, ধর্মের নামে করিছ ধর্মলোপ ;
তুমি সুখে ব'সে ধুলা ছড়াইছ সরল লোকের চোখে,
অবলা অখলা পথে পথে আহা ফিরিছে অন্নশোকে!"
কহিল কবীর, "অপরাধী আমি, ঘরে এসো, নারী, তবে—
আমার অন্ন রহিতে কেন বা তুমি উপবাসী রবে।"

দুষ্টা নারীরে আনি গৃহমাঝে বিনয়ে আদর করি
কবীর কহিল, "দীনের ভবনে তোমারে পাঠালো হরি।"
কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে,
"লোভে প'ড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।"

কহিল কবীর, "ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ ;
এনেছ আমার মাথার ভূষণ— অপমান, অপবাদ।"

ঘুচাইল তার মনের বিকার, করিল চেতনা দান ;
সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে হরিনামগুণগান।
রটি গেল দেশে— কপট কবীর, সাধুতা তাহার মিছে।
শুনিয়া কবীর কহে নতশির, "আমি সকলের নীচে।
যদি কূল পাই তরণীগরব রাখিতে না চাহি কিছু ;
তুমি যদি থাকো আমার উপরে, আমি রব সব নিচু।"

রাজার চিত্তে কৌতুক হল শুনিতে সাধুর গাথা ;
দূত আসি তাঁরে ডাকিল যখন সাধু নাড়িলেন মাথা।
কহিলেন, "থাকি সবা হতে দূরে আপন হীনতা-মাঝে ;
আমার মতন অভাজন জন রাজার সভায় সাজে ?"
দূত কহে, "তুমি না গেলে ঘটিবে আমাদের পরমাদ ;
যশ শুনে তব হয়েছে রাজার সাধু দেখিবার সাধ।"

রাজা বসে ছিল সভার মাঝারে, পারিষদ সারি সারি ;
কবীর আসিয়া পশিল সেথায় পশ্চাতে লয়ে নারী।
কেহ হাসে কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নতশিরে ;
রাজা ভাবে, এটা কেমন নিলাজ, রমণী লইয়া ফিরে !

ইঙ্গিতে তাঁর সাধুরে সভার বাহির করিল দ্বারী ;
বিনয়ে কবীর চলিল কুটিরে সঙ্গে লইয়া নারী।

পথমাঝে ছিল ব্রাহ্মণদল, কৌতুকভরে হাসে ;
শুনায়ে শুনায়ে বিদ্রূপবাণী কহিল কঠিন ভাষে।
তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে—
কহিল, "পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে ;
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান !"
কহিল কবীর, "জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।"

২৮ আশ্বিন ১৩০৬

স্বামীলাভ

ভক্তমাল

একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে
নির্জন শ্মশানে
সন্ধ্যায় আপন-মনে একা একা ফিরে
মাতি নিজ গানে।
হেরিলেন মৃত পতি-চরণের তলে
বসিয়াছে সতী—
তাঁরি সনে এক সাথে এক চিতানলে
মরিবারে মতি।
সঙ্গীগণ মাঝে মাঝে আনন্দচীৎকারে
করে জয়নাদ,
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ঘেরি চারি ধারে
গাহে সাধুবাদ!

সহসা সাধুরে নারী হেরিয়া সম্মুখে
করিয়া প্রণতি
কহিল বিনয়ে, "প্রভো, আপন শ্রীমুখে
দেহো অনুমতি।"

তুলসী কহিল, “মাতঃ, যাবে কোন্‌খানে,
 এত আয়োজন ?”
সতী কহে, “পতিসহ যাব স্বর্গ-পানে
 করিয়াছি মন।”
“ধরা ছাড়ি কেন, নারী, স্বর্গ চাহ তুমি”
 সাধু হাসি কহে,
“হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
 তাঁহারি কি নহে!”

বুঝিতে না পারি কথা নারী রহে চাহি
 বিস্ময়ে অবাক—
কহে করজোড় করি, “স্বামী যদি পাই
 স্বর্গ দূরে থাক্‌।”
তুলসী কহিল হাসি, “ফিরে চলো ঘরে—
 কহিতেছি আমি,
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে
 আপনার স্বামী।”
রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায়
 শ্মশান তেয়াগি;
তুলসী জাহ্নবীতীরে নিস্তব্ধ নিশায়
 রহিলেন জাগি।

নারী রহে শুদ্ধচিতে নির্জন ভবনে—
তুলসী প্রত্যহ
কী তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে
ধ্যায় অহরহ।
একমাস পূর্ণ হতে প্রতিবেশীদলে
আসি তার দ্বারে
শুধাইল, "পেলে স্বামী ?" নারী হাসি বলে,
"পেয়েছি তাঁহারে।"
শুনি ব্যগ্র কহে তারা, "কহো তবে কহো
আছে কোন্ ঘরে।"
নারী কহে, "রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে।"

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

স্পর্শমণি

ভক্তমাল

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, "কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর।"
বিপ্র কহে, "কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহু দূর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে;
এত বড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা—

একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে
'পুরিবে প্রার্থনা—
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায় ;
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।' ”

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন,
'কী আছে আমার।
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষামাত্র সার।'
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,
“ঠিক বটে ঠিক !
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।”

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি;
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।

নদীপারে রক্তচ্ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে;
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মানো না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে" এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে "গুরুজির জয়"
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।

"অলখ নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝন্‌ঝন্।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল,
"অলখ নিরঞ্জন।"

এসেছে সে এক দিন—
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে,
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে এক দিন।

দিল্লি-প্রাসাদকূটে
হোথা বার বার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে—
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে!

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কি রে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।

বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো
পঞ্চনদীর তীরে।

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে ;
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ-সনে।
সেদিন কঠিন রণে
"জয় গুরুজির" হাঁকে শিখ বীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
"দীন্ দীন্" গরজনে।

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল
তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত
বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লি-নগর-'পরে।

বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে।

সম্মুখে চলে মোগল-সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ-'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় "গুরুজির জয়"
পরানের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে
দিল্লিপথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি

"জয় গুরুজির" কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে—
কহিল, "ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"
দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে।

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকাল-তরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার
রাঙা উষ্ণীষখানি,
তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি

বালকের মুখ চাহি
"গুরুজির জয়" কানে কানে কয়—
"রে পুত্র, ভয় নাহি।"

নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোরকণ্ঠে কাঁপে সভাতল,
বালক উঠিল গাহি—
"গুরুজির জয়, কিছু নাহি ভয়"
বন্দার মুখ চাহি।

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণকরে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে—
"গুরুজির জয়" কহিয়া বালক
লুটালো ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।

স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ ;
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হল নিস্তব্ধ।

৩০ আশ্বিন ১৩০৬

মানী

আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান্‌খান্‌
মারবপতি কহিলা আসি,
"করহ, প্রভু, অবধান—
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর যাঁরে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহিপতি সুরতান।
কী অভিলাষ তাঁহার 'পরে,
আদেশ মোরে করো দান।"

শুনিয়া কহে আরঙজেব,
"কী কথা শুনি অদ্‌ভুত।
এত দিনে কি পড়িল ধরা
অশনি-ভরা বিদ্যুৎ!
পাহাড়ি লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত,
মরুভূমির মরীচিমত
স্বাধীন ছিল রাজপুত।

দেখিতে চাহি— আনিতে তারে
পাঠাও কোনো রাজদূত।’

মাড়োয়ারাজ যশোবন্ত
কহিলা তবে জোড়কর,
“ক্ষত্রকুলসিংহশিশু
লয়েছে আজি মোর ঘর—
বাদশা তাঁরে দেখিতে চান
বচন আগে করুন দান
কিছুতে কোনো অসম্মান
হবে না কভু তাঁর ’পর।
সভায় তবে আপনি তাঁরে
আনিব করি সমাদর।”

আরঙজেব কহিলা হাসি,
“কেমন কথা কহ আজ,
প্রবীণ তুমি প্রবল বীর
মাড়োয়াপতি মহারাজ।
তোমার মুখে এমন বাণী
শুনিয়া মনে শরম মানি,
মানীর মান করিব হানি—
মানীরে শোভে হেন কাজ।

কহিনু আমি, চিন্তা নাহি,
আনহ তাঁরে সভা-মাঝ।"

সিরোহিপতি সভায় আসে
মাড়োয়ারাজে লয়ে সাথ,
উচ্চ শির উচ্চে রাখি
সমুখে করে আঁখিপাত।
কহিল সবে বজ্রনাদে
"সেলাম করো বাদশাজাদে"—
হেলিয়া যশোবন্ত-কাঁধে
কহিলা ধীরে নরনাথ,
"গুরুজনের চরণ ছাড়া
করি নে কারে প্রণিপাত।"

কহিলা রোষে রক্ত-আঁখি
বাদশাহের অনুচর,
"শিখাতে পারি কেমনে মাথা
লুটিয়া পড়ে ভূমি-'পর।"
হাসিয়া কহে সিরোহিপতি,
"এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি—
জানি নে কভু ভয়-ডর!"

এতেক বলি দাঁড়ালো রাজ
কৃপাণ-'পরে করি ভর।

বাদশা ধরি সুরতানেরে
বসায়ে নিল নিজ'-পাশ।
কহিলা, "বীর, ভারত-মাঝে
কী দেশ-'পরে তব আশ।"
কহিলা রাজা, "অচলগড়
দেশের সেরা জগৎ-'পর।"
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস।
বাদশা কহে, "অচল হয়ে
অচলগড়ে করো বাস।"

১ কার্তিক ১৩০৬

প্রার্থনাতীত দান

শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরন
হইল ধরণীতল।

নবাব কহিল, "শুন তরুসিং,
তোমারে ক্ষমিতে চাই।"
তরুসিং কহে, "মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই!"
নবাব কহিল, "মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ—
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ।"
তরুসিং কহে, "করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।"

২ কার্তিক ১৩০৬

রাজবিচার

রাজস্থান

বিপ্র কহে, "রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে,
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্মনাশ-তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহো
চোরে কী দিব সাজা।"
"মৃত্যু" শুধু কহিলা তারে
রতনরাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত,
"চোর সে যুবরাজ—
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে,
কাটিল প্রাতে আজ
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে,
কী তারে দিব সাজা।"
"মুক্তি দাও" কহিলা শুধু
রতনরাও রাজা।

৪ কার্তিক ১৩০৬

গুরু গোবিন্দ

"বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
এখনো সময় নয়"—
নিশি-অবসান, যমুনার তীর,
ছোটো গিরিমালা বন সুগভীর ;
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটিছয়।

"যাও রামদাস, যাও গোলেহারি,
সাহু ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে,
এখনো পড়িয়া থাক্ বহু দূরে
জীবনরঙ্গভূমি।

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে।
সুদূরে মানবসাগর অগাধ,
চিরক্রন্দিত ঊর্মিনিনাদ—
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'যাই যাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্প-সমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্ ঝন্।

হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে—
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি—
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সমুখে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয়বহ্নিধূমে।

শতবার ক'রে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারি-দিক-ময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়—
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

'আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখসম্পদ-মায়ামমতার
বন্ধন যায় টুটে।

সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া 'আয় আয় আয়'
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া 'আয় তোরা আয়'
ভেঙে যায় ঘুমঘোর।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন—
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি গণি
অনিমেষ চোখে পূর্বগগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্পজগতে,
অরণ্য রাজধানী—
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা
আপন মর্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গমগিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে—
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু।'

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কত দূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক কত শত।

'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি—
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে
ঘনঘোর ঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,
তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো— নিবিবে না ঝড়ে,
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এসো দেখি সবে যাবার সময়—
বলো দেখি সবে 'গুরুজির জয়',
দুই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'।"

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

শেষ শিক্ষা

একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
আপন জীবনকথা— যে সংকল্পলেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণ রূপে দিয়েছিল দেখা
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকুল,
সে আজি সংকটমগ্ন। তবে একি ভুল।
তবে কি জীবন ব্যর্থ।— দারুণ দ্বিধায়
শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায়
গোবিন্দ ভাবিতেছিল ; হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, “যাব চলি দেশে,
ঘোড়া যে কিনেছ তুমি দেহো তার দাম।”
কহিল গোবিন্দ গুরু, “শেখজি, সেলাম।
মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই !”
পাঠান কহিল রোষে, “মূল্য আজই চাই।”
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত
“চোর” বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি ;

রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, "বুঝিলাম আজ,
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।"

পুত্র ছিল পাঠানের বয়স নবীন,
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মতো
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত
আপনি শিখালো তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি, "একি প্রভু, একি!
আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্রশাবকেরে
যত যত্ন কর তার স্বভাব কি ফেরে।
যখন সে বড়ো হবে তখন নখর,
গুরুদেব, মনে রেখো হবে যে প্রখর।"

গুরু কহে, "তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে।"

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া-হেন ফিরে সাথে,
পুত্র-হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন, সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—
আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠান-তনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে হৃদয়
গুরুজির। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বাজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
"শিক্ষা মোর সারা হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে।"
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
"আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।"

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা ; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি,
"অস্ত্র হাতে এসো মোর সাথে।" ভক্তদল
"সঙ্গে যাব, সঙ্গে যাব" করে কোলাহল।
গুরু কন, "যাও সবে ফিরে।"

দুই জনে,
কথা নাই, ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকূলে
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি। সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল, তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে। নদী হাঁটুজল,
ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চলে এক ধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে
ইশারা করিল গুরু, পাঠান দাঁড়ালো।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ-রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি,
পশ্চিমপ্রান্তর-পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে,
"মামুদ, হেথায় এসো, খোঁড়ো এইখানে।'

উঠিল সে বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা,
"পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত। এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময়। আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার, পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণরক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।"

বাঘের মতন

হুংকারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পড়িল গুরুর 'পরে— গুরু রহে স্থির
কাঠের মূর্তির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান;
কহিল, "হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু ব'লে জেনেছি তোমারে
এত দিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা প'ড়ে হিংসা যাক ম'রে। প্রভু, দেহো

পদধূলি।"— এত বলি বনের বাহিরে
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল; না চাহিল ফিরে,
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্র হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু-সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

একদিন আরম্ভিলা শতরঞ্জ-খেলা
গোবিন্দ পাঠান-সাথে। শেষ হল বেলা
না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁট-শিরে
পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন্ হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু; কহে অট্টহাসি,
"পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি

এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার ?”
তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, “এত দিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু— আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার !”

৬ কার্তিক ১৩০৬

নকল গড়

রাজস্থান

"জলস্পর্শ করব না আর'
 চিতোর-রানার পণ,
"বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
 থাকবে যতক্ষণ।"
"কী প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধবে তা আজ"
 কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, "সাধ্য না হয়
 সাধব আমার পণ।"

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
 যোজন-তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
 মহা মহা শূর।

হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা—
তাহার সত্য প্রমাণ রানা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন-তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
"আজকে সারা রাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী!"
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য
হারাবংশী বীর—
হরিণ মেরে আসছে ফিরে,
স্কন্ধে ধনু তীর।

খবর পেয়ে কহে, "কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির।
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর।"

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রানা মহারাজ।
"দূরে রহো" কহে কুম্ভ—
গর্জে যেন বাজ।
"বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।"
কহে কুম্ভ, "দূরে রহো
রানা মহারাজ!"

ভূমির 'পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।

রানার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে—
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি-'পর,
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।

৭ কার্তিক ১৩০৬

হোরিখেলা

রাজস্থান

পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে
　　কেতুন হতে ভূনাগ রাজার রানী,
"লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা ?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া—
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া,
　　হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।"
যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি
　　কেতুন হতে পত্র দিল রানী।

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি
　　মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে,
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধ-ভরা রুমাল নিল হাতে,
　　সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান-সাথে হোরি খেলবে রানী—
　　কেসর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আমের বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে—
গুন্‌গুনিয়ে আপন মনে মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতুনপুরে দলে দলে আজি
পাঠান সেনা হোরি খেলতে এল।

কেতুনপুরে রাজার উপবনে
তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি,
মুলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি,
এল তখন একশো রানীর দাসী
রাজপুতানী করতে হোরিখেলা।
রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা।

পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে,
ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।
ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি—

বাম হস্তে গুলাল-ভরা ঝারি—
সারি সারি রাজপুতানী আসে।
পায়ে পায়ে ঘাঘরা উঠে দুলে,
ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে
কেসর তবে কহে কাছে আসি,
"বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি,
আজকে বুঝি জানে-প্রাণে মরি।"
শুনে রানীর শতেক সহচরী
হঠাৎ সবে উঠল অট্টহাসি।
রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেসর খাঁ
রঙ্গভরে সেলাম করে আসি।

শুরু হল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরন ধরল বকুলফুলে,
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

'চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা'
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ,
'বক্ষ কেন উঠছে নাকো দুলি,
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি,
কেমন যেন বলছে বেসুর বুলি,
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে না।'
'চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা'
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।

পাঠান কহে, 'রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা।
বাহুযুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত,
বড়ো কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরিহীন মরুভূমির লতা।'
পাঠান ভাবে, দেহে কিম্বা মনে
রাজপুতানীর নাইকো কোমলতা।

তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠল দ্রুত তালে।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা—

দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা
রানী বনে এলেন হেনকালে।
তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে।

কেসর কহে, "তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা।"
রানী কহে, "আমারও সেই দশা!"
একশো সখী হাসিয়া বিবশা—
পাঠান-পতির ললাটে সহসা
মারেন রানী কাঁসার থালাখানা।
রক্তধারা গড়িয়ে প'ড়ে বেগে
পাঠান-পতির চক্ষু হল কানা।

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরুতলে-তলে
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হল নারীসজ্জা ছেড়ে,
এক শত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে একশো সাপের মতো।
স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

৯ কার্তিক ১৩০৬

বিবাহ

রাজস্থান

প্রহর-খানেক রাত হয়েছে শুধু
  ঘন-ঘন বেজে ওঠে শাঁখ।
বরকন্যা যেন ছবির মতো
আঁচল-বাঁধা দাঁড়িয়ে আঁখি-নত,
জানলা খুলে পুরাঙ্গনা যত
  দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।
বরষারাতে মেঘের গুরুগুরু,
  তারি সঙ্গে বাজে বিয়ের শাঁখ।

ঈশান কোণে থমকে আছে হাওয়া,
  মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি।
সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে
মণিমালায় ঝিলিক হানে চোখে,
সভার মাঝে হঠাৎ এল ও কে,
  বাহির-দ্বারে বেজে উঠল ভেরি।
চমকে ওঠে সভার যত লোকে,
  উঠে দাঁড়ায় বর-কনেরে ঘেরি।

টোপর-পরা মৈত্রিরাজকুমারে
কহে তখন মাড়োয়ারের দূত,
"যুদ্ধ বাধে বিদ্রোহীদের সনে,
রামসিংহ রানা চলেন রণে,
তোমরা এসো তাঁরি নিমন্ত্রণে
যে যে আছ মর্তিয়া রাজপুত।"
"জয় রানা রাম্‌সিঙের জয়"
গর্জি উঠে মাড়োয়ারের দূত।

"জয় রানা রাম্‌সিঙের জয়"
মৈত্রিপতি ঊর্ধ্বস্বরে কয়।
কনের বক্ষ কেঁপে ওঠে ডরে,
দুটি চক্ষু ছলোছলো করে—
বরযাত্রী হাঁকে সমস্বরে,
"জয় রানা রাম্‌সিঙের জয়!"
"সময় নাহি মৈত্রিরাজকুমার"
মহারানার দূত উচ্চে কয়।

বৃথা কেন ওঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা কেন বেজে ওঠে শাঁখ।
বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর,
মুখের পানে চাহে পরস্পর—

কহে, "প্রিয়ে, নিলেম অবসর,
এসেছে ওই মৃত্যুসভার ডাক।"
বৃথা এখন ওঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা এখন বেজে ওঠে শাঁখ।

বরের বেশে টোপর পরি শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।
মলিন মুখে নম্র নতশিরে
কন্যা গেল অন্তঃপুরে ফিরে,
হাজার বাতি নিবল ধীরে ধীরে—
রাজার সভা হল অন্ধকার।
গলায় মালা, টোপর-পরা শিরে,
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।

মাতা কেঁদে কহেন, "বধূবেশ
খুলিয়া ফেল্ হায় রে হতভাগী!"
শান্তমুখে কন্যা কহে মায়ে,
"কেঁদো না মা, ধরি তোমার পায়ে।
বধূসজ্জা থাক্, মা, আমার গায়ে—
মৈত্রিপুরে যাইব তাঁর লাগি।"
শুনে মাতা কপালে কর হানি
কহেন, "হায় রে হতভাগী!"

গ্রহবিপ্র আশীর্বাদ করি
ধানদূর্বা দিল তাহার মাথে।
চড়ে কন্যা চতুর্দোলা-'পরে.
পুরনারী হুলুধ্বনি করে,
রঙিন বেশে কিংকরী কিংকরে
সারি সারি চলে বালার সাথে।
মাতা আসি চুমো খেলেন মুখে,
পিতা আসি হস্ত দিলেন মাথে।

নিশীথ-রাতে আকাশ আলো করি
কে এল রে মৈত্রিপুরদ্বারে।
"থামাও বাঁশি" কহে, "থামাও বাঁশি,
চতুর্দোলা নামাও রে দাস-দাসী—
মিলেছি আজ মৈত্রিপুরবাসী
মৈত্রিপতির চিতা রচিবারে।
মৈত্রি রাজা যুদ্ধে হত আজি,
দুঃসময়ে কারা এলে দ্বারে।"

"বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি"
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে,
"এবার লগ্ন আর হবে না পার,
আঁচলে গাঁঠ খুলবে না তো আর—

শেষের মন্ত্র উচ্চারো এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে।"
"বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি"
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে।

বরের বেশে মোতির মালা গলে
মৈত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের 'পরে থুয়ে।
নিশীথ-রাতে মিলন-সজ্জা-পরা
মৈত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।

ঘন-ঘন জাগল হুলুধ্বনি,
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা।
কয় পুরোহিত, "ধন্য সুচরিতা!"
গাহিছে ভাট, "ধন্য মৃত্যুজিতা!"
ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনা।
জয়ধ্বনি উঠে শ্মশান-মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।

১১ কার্তিক ১৩০৬

বিচারক

পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন -প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত। অ্যাক্‌ওয়ার্থ্ সাহেব -প্রণীত Ballads of the Marathas নামক গ্রন্থে, রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও—
পেশোয়া-নৃপতি বংশ—
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর,
"হরণ করিব ভার পৃথিবীর,
মৈসুর-পতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।"

দেখিতে দেখিতে পুরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে, নানা পথে পথে,
মারাঠার যত গিরিদরী হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা,
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।

হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
মারাঠা-নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরবডঙ্ক।

ধুলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকালো প্রভাতসূর্য।
রক্ত অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়কোলাহলে—
সহসা যেন কী মন্ত্রের বলে
থেমে গেল রণতূর্য।

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানালো পরম দৈন্য!
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে
আশি সহস্র সৈন্য।

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়ালো সমুখে
ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।

দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি, "রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও
না লয়ে পাপের শাস্তি।"

নীরব হইল জয়কোলাহল,
নীরব সমরবাদ্য।
"প্রভু, কেন আজি" কহে রঘুনাথ—
"অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ,
চলেছি করিতে যবননিপাত
জোগাতে যমের খাদ্য।"

কহিলা শাস্ত্রী, "বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
ন্যায়ের বিধানসূত্রে।"

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও,
কহিলা করিয়া হাস্য—

"নৃপতি কাহারও বাঁধন না মানে
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে
ন্যায়বিধানের ভাষ্য।"

কহিলা শাস্ত্রী, "রঘুনাথ রাও,
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।"

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

৩ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পণরক্ষা

"মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই—
করো করো সবে সাজ"
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু-পহরে যে যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধূলা
মারাঠি অশ্বখুরে।
"মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন"
গর্জিলা দুমরাজ।

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে,
"বৃথা এ সৈন্যসাজ।

হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র
দুর্গেশ দুমরাজ।
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি—
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ
আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ-'পরে—
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়
দিবে মারাঠার করে।"
"প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে
বিরোধ বাধিল আজ"
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ।

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা
"ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।"
রহিল পাষাণ-মুরতি-সমান
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায় যায়, ধূধূ করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু—

তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।
'আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে,
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ।'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমরসাজ;
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম-মাঠ-পারে;
মারাঠি সৈন্য ধুলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।
"দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান।
ওঠো ওঠো খোলো দ্বার"—

কথা

নাহি শোনে কেহ, প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

কা হি নী

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
বাহিয়া চেতনাবাহিনী !
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত—
ছিন্নসূত্র বাছি শত শত
তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
ওগো হৃদয়ের গেহিনী !
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
কত ভুলি কত হয়ে আসে ক্ষীণ—
তুমি তাই লয়ে বিরামবিহীন
রচিছ জীবনকাহিনী।
আঁধারে বসিয়া কী যে কর কাজ
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

কত যুগ ধরে এমনি গাঁথিছ
হৃদিশতদলশায়িনী !
গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে
কী যে আছে কী যে নাই কেবা জানে,
কী জানি রচিলে আমার পরানে
কত-না যুগের কাহিনী—
কত জনমের কত বিস্মৃতি
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি ;
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে—
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা ;
সভার লোকে শুনে অবাক মানে, সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপরায় কাঠের মতো বসি আছে ;
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভালো না লাগে তার কাছে।
বালক-বেলা হতে তাহারি গীতে দিল সে এত কাল যাপি—
বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পুরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মুলতানি সুরে।
ঘরেতে বার বার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব-রাতি—
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস, জ্বলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নববর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,

সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে সাহানার সুর—
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারও গান শুনিলে তাই মর্মে গিয়ে নাহি লাগে
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপরায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথা-নাড়া—
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে ক্ষণেক-তরে বিরাম মাগে কাশীনাথ;
বরজলাল-পানে প্রতাপরায় হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে, শিকারী বিড়ালের খেলা।
সে কালে গান ছিল, এ কালে হায় গানের বড়ো অবহেলা।"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ, শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
মিনতি করি সবে সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমন-কল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহ-কোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপরায়, দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা বাহা বাহা" কহিছে কানে, "গলা ছাড়িয়া গান গাহ।"

সভার লোকে সবে অন্যমনা, কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চ'লে যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান" ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে, "গরম আজি অতিশয়।"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।

বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায় তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী—
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজসুখে
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে—
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ দু দিকে ধায় দুই জনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কী করিয়া,
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে— লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায়, পড়ে না মনে, শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান— আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি,
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা-হা করি।

কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি,
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি, অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার 'পরে রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপরায় কর বুলায় তার দেহে—
"আইস হেথা হতে আমরা যাই" কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা-কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, "প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।"

বোট। শিলাইদহ
২৪ আষাঢ় ১২৯৯

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, "কেস্টা বেটাই চোর।"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি "কেষ্টা"—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা;
মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা"—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, "আর পারি নাকো,
রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার, কেস্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!"

শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে ;
বলি তারে, "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায় ; পরদিনে উঠে দেখি,
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি—
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে— মোর পুরাতন ভৃত্য !

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম ! নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায় ; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত, তামাক সাজিয়া আনে !
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য !
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য !

নামিনু শ্রীধামে— দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।

জন-ছয়-সাতে মিলি এক-সাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা ; মনে হল আশা, আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি !
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত ! আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ ;
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, "কেষ্ট আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, "কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম ; তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন, বন্ধ হইল নাড়ী ;
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এত দিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ ;
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

১২ ফাল্গুন ১৩০১

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন ? এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি!
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া!
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে;
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।

ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এইমত কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল, নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু, বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
"মা" বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে—
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি ;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ, একি !
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম—
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম ;
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম, হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে ।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা—
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা !

হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি !
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব !"
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব খুন !"
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয় !"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয় ।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে !
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে !

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী ; নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর

মোক্ষদা কহিল আসি, "হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।" বিধবা যুবতী—
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। "স্থান কোথা আর"
মৈত্র কহিলেন তারে। "পায়ে ধরি তব"
বিধবা কহিল কাঁদি, "স্থান করি লব
কোনোমতে একধারে।" ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
"নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে।"
উত্তর করিল নারী, "রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে

বহু দিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা ; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে— সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।”

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে সেথা আগে-ভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-’পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। “তুই হেথা কেন ওরে”
মা শুধালো। সে কহিল, “যাইব সাগরে।”
“যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।” পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, “যাইব সাগরে।”
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে

রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
"থাক্ থাক্, সঙ্গে যাক।" মা রাগিয়া বলে,
"চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ—
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়,
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।"

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, "বাছা, কোথা যাবি ওরে!"
রাখাল কহিল হাসি, "চলিনু সাগরে।
আবার ফিরিব মাসি!" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, "ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার

মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও ;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।"
রাখাল কহিল, "মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।" বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, "যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই ; যাতায়াতে মাস-দুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।"

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি,
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।

যাত্রাদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল-অবসান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।

মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা ; তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে।

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
“ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার।”

সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—

আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
"দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে।'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে!
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। "তরণী ভিড়াও তীরে"
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর! চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে, আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম! তীব্রশীতপবনের সনে

মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্বডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
"বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ—
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা—
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।" যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, "দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, "এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।" "দাও তারে ফেলে"
এক বাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর

যাত্রী সবে। কহে নারী, "হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো।" দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।
ভৎ'সিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
"আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে—
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্ দেবতার ঋণ; সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!"
মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে— ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কত দূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর!
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!"

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তাঁরে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা—

দংশিল বৃশ্চিকদংশ। "মাসি! মাসি! মাসি!"
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, "রাখ্ রাখ্ রাখ্।"
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
"মাসি" বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
"ফিরায়ে আনিব তোরে" কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে—
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল—
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল !
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে—
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দ-হীন।
ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উত্তরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে।
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা" চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।

আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনা-ভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বস্ত্রে, রিক্ত হাতে, শ্রান্ত নতশিরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

"এখনো উঠাতে পারি" করজোড়ে যাচে,
"যদি দেখাইয়া দাও কোনখানে আছে।"
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে।"

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

দীনদান

নিবেদিল রাজভৃত্য, "মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্‌বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসা-ভরে, সেইমত নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
"হেরো, প্রভু, স্বর্ণ-শীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়— তারে কেন করিয়া বর্জন

দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে।”
“সে মন্দিরে দেব নাই” কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
“দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-’পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা?”

“শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ” সাধু কহে—
“আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।”

ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, “বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোনো স্থান!”

শান্তমুখে কহে সাধু, “যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর

দেবতারে সমর্পিলে ! সেদিন কহিলা ভগবান,
‘আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্তনীলিমামাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান !’ চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন্ যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ।”

রাজা জ্বলি রোষানলে
কহিলেন, “রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ ক’রে
এ মুহূর্তে চলি যাও।”

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
“ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত করো ভক্তজনে।”

২০ শ্রাবণ ১৩০৭

বিসর্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর
বয়স না হতে হতে পুরা দু বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন
স্বামীরেও হারালো মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল— পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে।
ব্রতধ্যান-উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে,
পূজাগৃহে ; কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি ;
শুনে রামায়ণকথা ; সন্ন্যাসী-সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্ব-নীচে
সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান-লাগি ; সূর্য চন্দ্র হতে
পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি— কোনোমতে

কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা, সকলের কাছে
আকুল বেদনা-ভরে দীন হয়ে আছে।

যখন বছর-দেড় বয়স শিশুর—
যকৃতের ঘটিল বিকার ; জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানত মাতা, পদামৃত লয়ে
করাইল পান, হরিসংকীর্তন-গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধালো নারী, "ব্রাহ্মণঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর!
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা, তবু রক্ষা নাই!
তবু কি নেবেন তারা আমার বাছারে!
এত ক্ষুধা দেবতার! এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না!"
ব্রাহ্মণ কহিল, "বাছা, এ যে ঘোর কলি।
অনেক করেছ বটে, তবু এও বলি—

আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো ?
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পারো ?
দানবীর কর্ণ-কাছে ধর্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,
নিজ হস্তে সন্তানে কাটিল ; তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমেষে।
শিবিরাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে—
পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমণ্ডলে।
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে— তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা-গঙ্গার কাছে। শেষে পুত্রজন্ম-পরে,
অভাগী বিধবা হল ; গেল সে-সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা-গঙ্গারে ডেকে,
'মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,
এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই।'
যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী-রূপে হয়ে মূর্তিমতী

শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল।— নিষ্ঠা এরে বলে।"

মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির ক'রে,
আপনারে ধিক্কারিল, "এত দিন ধরে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চনা—
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।"

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে; অঙ্গ যেন অগ্নির মতন।
ঔষধ গিলাতে যায় যত বার বার
পড়ে যায়— কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর।
দন্তে দন্তে গেল আঁটি। বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়নশিয়রে,
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারি ধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর—
"ও মানিক, ওরে সোনা, এই-যে মা তোর,
এই-যে মায়ের কোল, ভয় কী রে বাপ।"
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ

চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল ; ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি ;
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিল নারী,
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি ;
কহিল, "মায়ের ডাক ওই শোনা যায়—
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়—
তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা।"

জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে, এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা, গেল শূন্য ঘাট-পানে।
কহিল, "মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দে গো মা, জুড়ায়ে
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
একমনে।" এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি। বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না।
ধ্যানে নিরখিল বসি, মকরবাহনা

জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে করে এসেছেন, রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল। হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি দেবী-কোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, "রে দুঃখিনী, এই তুই ধর্‌,
তোর ধন তোরে দিনু।" রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, "কই মা··· কোথায়!"···
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী, "দিবি নে ফিরায়ে!"
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে।

২৪ আশ্বিন ১৩০৬

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, "শুন গো গোবুরায়,
　　কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
　　ধরণীমাঝে চরণ ফেলা মাত্র।
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
　　রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
　　রাজ্যে মোর এ কী এ অনাসৃষ্টি।
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
　　নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
　　দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
　　পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
　　কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
　　কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে—

"যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে।"

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি;
কহিল শেষে, "কথাটা বটে সত্য।
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে।
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।"

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতন-ভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী—
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নস্য।

অনেক ভেবে কহিল, "গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য।"
কহিল রাজা, "তাই যদি না হবে
পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে।"

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য;
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, "করিতে ধুলা দূর
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর।"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।

জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, "এমনি সব গাধা,
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।"

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে
ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।
কহিল, "মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।"
কহিল কেহ, "রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।"

কহিল রাজা, "সে কথা বড়ো খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ—

মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।"
কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।"
কহিল সবে, "হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমত চামার যদি মেলে।"

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমত চর্ম।
তখন ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

কহিলা রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।"
মন্ত্রী কহে, "বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।"
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে—
মন্ত্রী কহে, "আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে!"
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

১৩০৪

—

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ। মাধ্যমিক পরীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষার সহায়কপাঠ : কাব্যগ্রন্থ

মূল্য ১৫·০০ টাকা